উন্নয়নে বাংলাদেশ

যুগান্তর

উন্নয়নে বাংলাদেশ

ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ০০:০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

বাংলাদেশ এখন সারা পৃথিবীতে সাড়া জাগানো অর্থনৈতিক উন্নয়নের মহাসড়কে দ্রুতগতিতে অগ্রসরমান। ১৯৭২ সালের ৮০০ কোটি ডলারের ক্ষুদ্র জিডিপি এখন ৩৪৫০০ কোটি মার্কিন ডলারের একটি বেশ বড় অর্থনীতি। ১৯৭০-৭১ অর্থবছরে সামষ্টিক আয়ে ছিল নেতিবাচক-১২ শতাংশ সংকোচন। আর করোনার ছোবলের আগ পর্যন্ত বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি শতকরা ৮ ভাগের উপরে বিরাজমান ছিল। মাথাপিছু আয়ে ১৯৭২ সালে ৮৫ মার্কিন ডলার এখন ২৫৫৪ মার্কিন ডলারে। সামষ্টিক আয়ের অনুপাত হিসাবে বহিঃবাণিজ্যে ১৯৭২ সালে শতকরা ২ ভাগের কম ছিল; এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৫ ভাগে। মোট সামষ্টিক আয়ে মাধ্যমিক খাতের অবদান ১৯৭২ সালে ছিল শতকরা ১৭ ভাগ তার মধ্যে শিল্পোৎপাদনের ছিল শতকরা ৮ ভাগ। করোনা পূর্ববর্তী সময়ে বার্ষিক সামষ্টিক আয়ে মাধ্যমিক খাতের অবদান ছিল শতকরা ৩৩ ভাগ (শিল্পোৎপাদনে শতকরা ১৮ ভাগ)।

১৯৭২ সালে ৭.৫ কোটি মানুষের মধ্যে ৬.০ কোটি ছিলেন দারিদ্র্যসীমার নিচে; করোনা-পূর্ববর্তী ২০২০-২১ সময়ে ১৬.৫০ কোটি জনসংখ্যার বাংলাদেশে দরিদ্র লোকের সংখ্যা ছিল ৩.১ কোটি। এ অর্ধশতকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ৩.৩ ভাগ থেকে শতকরা ১.৩ হারে নামানো সম্ভব হয়েছে। ইতোমধ্যে খাদ্য উৎপাদন ১.১ কোটি টন থেকে প্রায় ৪.০ কোটি টনে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের গড় আয়ুষ্কাল ৪৩ বছর থেকে বেড়ে এখন ৭২। শিশুমৃত্যুর হার হাজারে প্রায় ২০০ থেকে ৩০-এর নিচে নামানো সম্ভব হয়েছে।

১৯৭২ সালের ৭৮৬ কোটি টাকার বাজেট এখন ৬০৩৬৮১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর দর্শন : রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, কূটনীতি

একটি পশ্চিমা ধাঁচের উদার গণতান্ত্রিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করা আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে বাম ধারার একটি শক্তিও ছিল। ৫৪-এর নির্বাচনে অনেক কম্যুনিস্ট ও বাম ধারার নেতা-কর্মী হুলিয়া থেকে বের হয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। সামরিক চুক্তিতে পাকিস্তানের থাকা না থাকা নিয়ে দলটিতে মতদ্বৈধতা ও বিতর্ক এমনিতে ছিল। ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনের পর মওলানা ভাসানী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী অংশটিকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেলে শেখ মুজিবুর রহমান মূলধারায় সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বে উদার গণতান্ত্রিক অংশকে বলীয়ান করতে সচেষ্ট হন। ততদিনে তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমেদ তার নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী ‘সমাজতন্ত্রেই মুক্তি’ ধারাকে জিইয়ে রাখেন।

১৯৬০-এর দশকে বিশ্বব্যাপী ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ ‘দুনিয়ার মজদুর এক হও’ ইত্যকার স্লোগানে বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক বিশ্বে বৈষম্যের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ আওয়াজ ওঠে। ভারত ও পাকিস্তানে অর্থনৈতিক সক্ষমতা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংকিং ও বিমা খাতকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। পাকিস্তানের ২২ পরিবার কোটিপতি (মাত্র একজন পূর্ব পাকিস্তানে) হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ দানা বাঁধে। আওয়ামী শব্দের অর্থ জনগণ; আওয়ামী লীগ সে সময় জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সমাজতন্ত্রকে একটি মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করে।

উনসত্তরের বিশ্বখ্যাত গণঅভ্যুত্থানের ঢেউ আগড়তলা মামলাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়; বিচারপতি পালিয়ে যান। মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিবের পরামর্শ গ্রহণ করে শেখ মুজিব প্যারোলে গোল টেবিলে যেতে অস্বীকার করেন। বাংলার দামাল ছেলেমেয়েরা জেলের তালা ভেঙে শেখ মুজিবকে মুক্ত করে। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এবং দেশবাসীর পক্ষে ডাকসু ভিপি তথা ছাত্রলীগ সভাপতি তোফায়েল আহমদ ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে জনগণের প্রাণপ্রিয় সম্মোহনী শক্তির অধিকারী শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু অভিধায় ভূষিত করেন। অনুরূপভাবে পাকিস্তান শক্তিমান সেনা সরকারের কারাগারে

আটক ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার অপেক্ষমাণ বঙ্গবন্ধুকে অতিশয় সম্মানের সঙ্গে মুক্তি দেওয়া হয় ৮ জানুয়ারি ১৯৭২। ১০ জানুয়ারি বীর বেশে স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পণ করেন মুক্ত বিহঙ্গ বঙ্গবন্ধু। রেসকোর্সের ময়দানে জমায়েত দশ লাখ জনতা গগনবিদারী স্লোগানে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাদের বিজয়ী বীরকে জাতির পিতা হিসাবে বরণ করে নিলেন।

স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাঝে ওই দিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, 'এই স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়, এ স্বাধীনতা পূর্ণ হবে না যদি, বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়, এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এ দেশের যুবক যারা আছে তারা কাজ না পায়। আজ থেকে বাংলায় যেন আর চুরি ডাকাতি না হয়, লুটতরাজ না হয়।' এটিই কিন্তু মোদ্দা কথায় জাতির পিতার আজীবন সাধনা ও আত্মত্যাগের রাজনীতির মূল উপজীব্য এবং অর্থনীতির মোটা দাগের দর্শন। সমাজ সংস্কারে সুষম এবং সমতাপ্রবণ জাতিগোষ্ঠী গড়ার প্রত্যয়ও এতে ফুটে ওঠে। 'সবার সঙ্গে সখ্য কারও সঙ্গে বৈরী নয়' ঘোষণা দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। কোনো সামরিক ব্লকে যোগ না দিয়ে জোট নিরপেক্ষ থাকার সাহসী পথ চলাও মুজিব ও বাংলাদেশের প্রতি বিশ্ববাসীর অসাধারণ শুভকামনা সৃষ্টিতে বিরাট অবদান রাখে। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলের সর্বকাণ্ডে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নীতিতে দৃঢ়কণ্ঠ ছিলেন বঙ্গবন্ধু।

জাতির পিতাকে ঘিরে রহস্য রোমাঞ্চ আছে, আছে বিতর্কও। তিনি কি একজন সমাজতন্ত্রী ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আস্থাভাজন ও শ্রদ্ধার আসনে থাকা দুনিয়াখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রফেসর নূরুল ইসলাম (পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান-মন্ত্রী) বলেছেন, "১৯৭২ সালে জাতীয়করণ নীতি নিয়ে ক্যাবিনেটে আলোচনার সময় দুই শিবিরের মধ্যে বিভেদ স্পষ্ট ছিল। ক্যাবিনেটের বাইরে জাতীয়করণের পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ছিল ছাত্র ও শ্রমিকরা, যারা সে সময় দারুণ প্রতিবাদী। বঙ্গবন্ধু অনেকটাই এদের পক্ষে ছিলেন। কারণ তিনি তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির প্রতি সৎ থাকা কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন। সমাজতন্ত্রের প্রতি নিজের অঙ্গিকারের কথা বারবার তিনি জনসমক্ষে প্রচার করেছিলেন। জাতীয়করণ নীতিতে আপস করা তার জন্য কঠিন ছিল।" (বণিক বার্তা, ২৯ জুলাই ২০১৮)

বঙ্গবন্ধুর আরেকজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর ও সহযোদ্ধা প্রফেসর রেহমান সোবহান (সদস্য, শিল্প, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন) রেদোয়ান মুজিব সিদ্দিক কর্তৃক সম্পাদিত অতিশয় বিশ্বমানের সাময়িকী হোয়াইটবোর্ডে (স্বাধীনতার তীর্থস্থান বাড়ি ৬৭৭, সড়ক ৩২, ধানমণ্ডি থেকে প্রকাশিত) ড. রওনক জাহানের সঙ্গে যৌথভাবে লিখেছেন, "..... nationalization and the extension of the public sector by

the development of the corporate enterprises and by the evolution of new institutional

arrangements such as worker participation in the equity and management of industrial enterprises" (Mujib's economic policies and their relevance today: by Rounaq Jahan and Rehman Sobhan- Cover Story White Board March 20.

আমার এ দুজন শিক্ষক এবং আরও অনেকেই জাতির পিতাকে একজন সাচ্চা সমাজতন্ত্রী হিসাবে তুলে ধরেন বটে; কিন্তু আমি ভিন্নমত পোষণ করি। বঙ্গবন্ধু আসলে পোড় খাওয়া একজন জনদরদি রাজনৈতিক যিনি বাঙালি ধ্যান ধারণা চিন্তা চেতনার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন। তাই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা এই সোনার বাংলায় সমাজতন্ত্রী না হয়ে একজন প্রয়োগবাদী (প্র্যাগমেটিক) স্নেহশীল অভিভাবক হিসাবে আবির্ভূত হন। সংবিধানের চারটি স্তম্ভের অন্যতম ছিল সমাজতন্ত্র; সেই মহান দলিলের ১৩ নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের সহায় সম্পত্তির মালিকানা তিন ধরনের-রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিগত ও সমবায়ী হবে বলে উল্লেখ করা আছে। সমাজতন্ত্রে কিন্তু অল মিন্স অব প্রডাকশন আর ওন্ড বাই দ্য স্টেট। তবে সমাজতন্ত্রের অন্যতম নির্যাস সমতাপ্রবণ বিতরণে টেকসই উন্নয়ন আর বৈষম্য নির্মূলে জাতির পিতার একটি কৃতসংকল্প সাধনা ছিল।

তিনি প্রয়োগবাদী হলেও মোটেও ধনতান্ত্রিক অবাধ বাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না বঙ্গবন্ধু। বৈষম্য তাকে ভীষণ পীড়া দিত। ২৬ মার্চ ১৯৭২ সালের ভাষণে তিনি সমতাপ্রবণ বণ্টন ব্যবস্থার প্রতি জোরদার বক্তব্য দেন। সংবিধানের অনেকগুলো অনুচ্ছেদে মানুষে মানুষে, নারী পুরুষে, ধনী নির্ধনে, গ্রামে শহরে বৈষম্য পরিহার করে সমতা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) দলিলে বলা হয়েছে যে, দেশের বার্ষিক সামষ্টিক আয় বৃদ্ধির হারের তুলনায় কম বিত্তবানদের আয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি করাতে হবে। প্রয়োজনে বিত্তবানদের উপর বেশি হারে কর ধার্য করে সেই অতিরিক্ত রাজস্ব দিয়ে কিষান কিষানি ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কল্যাণকর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে হবে। সমবায় ব্যবস্থা ছিল জাতির পিতার হৃদয়ের গভীরে। তার সেই বিখ্যাত উক্তি, 'ভাইয়েরা আমার, আসুন সমবায়ের জাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রামগুলোকে জাগিয়ে তুলি। নব সৃষ্টির উন্মাদনায় আর জীবনের জয়গানে তাকে মুখরিত করি।'

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল অংশের প্রথম বাক্য হলো :

"2.1 Objectives of the Plan

The basic objectives of the plan are as follows:

To reduce poverty. This is the foremost objective of the plan."

পাকিস্তানি শোষণের ২৪ বছরে বাংলাদেশের মানুষ দরিদ্র হয়েছে বলে দারিদ্র্য নির্মূল বঙ্গবন্ধুর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

মধ্যস্বত্বভোগীদের অতিরিক্ত মুনাফার কারণে উৎপাদনকারী ক্ষতিগ্রস্ত কারণ তারা পণ্যের উপযুক্ত মূল্য থেকে বঞ্চিত হন। আবার ক্রেতাদের গুনতে হয় অতিরিক্ত মূল্য। সে জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ মধ্যস্বত্বভোগী উৎপাত ব্যাপকভাবে হ্রাস করার পক্ষপাতি ছিলেন। চুয়াত্তরের মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষে মধ্যস্বত্বভোগী মিল মালিক মজুতদারদের নষ্ট ভূমিকা অনেকাংশেই দায়ী ছিল। বর্তমান সময়েও প্রায় সম্বৎসরের চাল, পেঁয়াজ, ভোজ্যতেল ইত্যাদি পণ্যে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে মুনাফাখোরী করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ ১৯৭৫-এর বিপর্যয় এবং মাঝে মধ্যে জনস্বার্থে উদাসীন সরকারের গদিনশিন থাকার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাঁধা এসেছে। তবে গত এক যুগে সর্বনাশা করোনার ছোবলের আগ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং হৃদয় উষ্ণ করা এর সামাজিক রূপান্তর বিশ্ববাসীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মাথাপিছু আয় (Per capita GNI)-এর হিসাবে ২০১৭ সালে পাকিস্তানকে এবং ২০২০ সালে ভারতকে টপকে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। তবে আত্মপ্রসাদের কোনোই অবকাশ নেই। অসামপ্ত অর্ধসমাপ্ত কাজগুলোকে করোনার আঘাত আরও কঠিন করে দিয়েছে।

দেশের কৃষককুল আমাদের খাবার অন্ন নিশ্চিত করেছেন। বস্ত্রে আমরা স্বয়ম্ভর যদিও তৈরি পোশাকে আমদানি করা কাপড়ে এবং বন্ডের ছিদ্র দিয়ে দুর্নীতি অপব্যবহার রোধ করা জরুরি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবকাঠামো বিস্তৃত ও মজবুত হয়েছে বাংলাদেশে। শ্রমজীবী ভাই বোনেরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি করেছেন। তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার রপ্তানি করে বিপুল সম্ভার দিয়ে প্রায় ৪৬০০ কোটি ডলারের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গড়তে অবদান রেখেছেন। প্রবাসে শ্রমজীবীদের সেবায় কষ্টার্জিত রেমিটেন্স প্রবাহ এখন দৃষ্টিনন্দন। শূন্যের কোটায় শুরু করা বাংলাদেশের শিল্প উদ্যোক্তারা এখন বিশ্বসভায় নন্দিত।

বর্তমান ভবিষ্যতের হালচাল ও করণীয়

করোনার কশাঘাতে অর্থনীতি বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাক্কলিত বার্ষিক সামষ্টিক আয় প্রবৃদ্ধি ৮.১ শতাংশ ছিল- অর্জন ৩.৫১ শতাংশ। অনুরূপভাবে ২০২০-২১ অর্থবছরে মূল প্রাক্কলন ৮.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি সংশোধন করে ৫.৪৭ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে; এটিও অর্জিত হয়েছে কিনা সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। বর্তমান বছরের ২০২১-২২ বাজেটে বার্ষিক সামষ্টিক আয়ের প্রবৃদ্ধি শতকরা ৭.২ হবে বলে যে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে তা অর্জনের আশা করা খুবই বাস্তবসম্মত নয়। মার্কিন অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি শুরু হয়েও থেমে যাচ্ছে। ইউরোপীয় সম্প্রসারণও করোনায় আবারও হুমকির সম্মুখীন। ভারতের অবস্থাও তেমন ভালো নেই। চীন ভালো করছে। তবু দেশটি তৈরি পোশাকে পুঁজি প্রত্যাহার করছে-এর সিংহভাগ দেশান্তর হচ্ছে ভিয়েতনামে। ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও মালয়েশিয়া তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বেশ ভালোভাবে অগ্রসরমাণ; উৎপাদনশীলতার অগ্রসরতা এবং ব্যবস্থাপনার

মুনশিয়ানার এ অর্জনের দাবিদার। বিশ্বব্যাংক বলছে সস্তাশ্রমে নিম্ন আয়ের জন্য কম মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে বেশিদূর যাওয়া যাবে না। ডিজাইন ও গন্তব্য বহুমুখীকরণ ছাড়া পোশাক রপ্তানি টেকসই হবে না। বিদেশি বিনিয়োগও প্রয়োজন। আমাদের রপ্তানি বাড়ছে না, আমদানি স্থিতিশীল তবে ভোগ্যপণ্য আমদানি বাড়ছে। রেমিটেন্স প্রবাহে আশঙ্কিত কমে যাওয়া শুরু হয়েছে। করোনার আঘাত থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য যে সাহসী ও বিপুল প্রণোদনা প্যাকেজ সরকার প্রধান ঘোষণা করেছেন শুরু থেকেই তার যে অংশটি কুটির, অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পের পুনরুত্থান ঘটানোর কথা তার সিংহভাগ অব্যবহৃত থাকছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের কর্মসংস্থান তথা আয়রোজগার শুধু যে বাড়ছে না তা নয়, আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে অভ্যন্তরীণ বিশেষ করে ভোগ্যপণ্যের খরচ দিয়ে অর্থনীতির পুনর্জাগরণের ধারাটি সচল হচ্ছে না। এ ব্যাপারে সরকার ও শিল্প বণিক সমিতিগুলো যৌথভাবে সমীক্ষা করে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় কুটির, অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পের ধারাটিকে দ্বিগুণ আলোয় প্রজ্বলিত করতে পারেন। এ ক্ষেতে ভেঞ্চার ক্যাপিটালের সহায়তা কাজে আসবে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় একটি বড় দুর্বলতা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অপ্রতুল বাস্তবায়ন এবং বছরের শেষের দিকে তাড়াহুড়ার খরচ। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সংশোধিত বরাদ্দের মাত্র শতকরা ৬০ ভাগ বাস্তবায়িত হয়; আর মে-জুন মাসে খরচ হয় শতকরা ৪০ ভাগ। মে-জুনের বৃষ্টি আর বন্যার পানির নিচে আর নদী ভাঙন ও বাঁধের ফাটলে দেশের অর্থসম্পদের একটি অংশ তলিয়ে যায়, দশের তেমন কোনো উপকার হয় না। অনাচার রোধে জানুয়ারি-ডিসেম্বর অর্থবছর করার জোর সুপারিশ পুনরায় পেশ করছি।

বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রাপথে সবচেয়ে লজ্জার জায়গা হলো পৃথিবীর প্রায় সর্বনিম্ন ট্যাক্স : জিডিপি অনুপাত (শতকরা দশ ভাগের নিচে এবং প্রবণতা নিম্নগামী)। বস্টন কনসাল্টি গ্রুপ ও মাস্টার কার্ড ২০১৬ সালেই সমীক্ষা করে দেখিয়েছে যে বাংলাদেশে ২.৫ কোটি লোকের হাতে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) মার্কিন ডলারের মাথাপিছু আয় এবং ভোগ্যপণ্যে চাহিদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠী রয়েছে। অথচ কর আদায় করেন মাত্র ২৫ লাখ করদাতা অর্থাৎ করযোগ্য আয় অর্জনকারীর মাত্র শতকরা ১০ ভাগের কাছ থেকে। আর কর রাজস্ব আদায় করতে না পারলে বিনিয়োগে পাবলিক সেক্টর কিভাবে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি ব্যক্তি খাতের প্রসারে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ ব্যাপারে আপদকালীন অগ্রাধিকারে সম্মিলিত এবং আপস মীমাংসার মাধ্যমে কার্যকর কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব এবং উচিত।

অর্থনীতির পুনরুত্থানে এবং জাতির পিতার দর্শন : সোনার বাংলায় কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এফ.বি.সি.সি.আইসহ ব্যক্তিখাতের সব অংশীদার দৃষ্টিনন্দনভাবে সফল ও বিশ্বনন্দিত সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সংস্কার এবং সংস্কার কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। উৎপাদন

ও রপ্তানিতে বহুমুখিতা নিশ্চিতের কাজ এবং সমতাপ্রবণ বিতরণ অর্থনীতি দিয়েই সংস্কার শুরু করা যায়।

লেখক: অর্থনীতিবিদ, সাবেক গভর্নর বাংলাদেশ ব্যাংক

সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯
থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৩০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২,
ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত

এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।

Developed by The Daily Jugantor © 2022